২

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এর সূচনা হলেও ক্রমে এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। দুই পর্বে বিভক্ত এই আন্দোলন ১৯৪৮ সালে অনেকটা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হলেও ১৯৫২ সালের আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। শুধু শিক্ষিত শ্রেণী নয়, বরং সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। এ পর্যায়ে শুধু ভাষার বৈষম্য নয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালির প্রতি বৈষম্য পরিস্ফুটিত করে। এর ফলে ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে একক রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন করে তোলে। এভাবে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ, নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি, উদার দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা, সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে নতুন পরিমন্ডলে নিয়ে যায়। বাঙালি জাতির পরবর্তীকালে সংগঠিত প্রতিটি আন্দোলনে প্রেরণা আসে ভাষা আন্দোলন থেকে। ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাই বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনে দীক্ষিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়। সুতরাং বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের ফলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে, প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১. ভাষা আন্দোলনের পটভূমি*
- *পাঠ-২. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন*
- *পাঠ-৩. ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য*

পাঠ-১

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *উর্দু বনাম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে উদ্দেশ্য ও যুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *ভাষা বিতর্কের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে পারবেন;*
- *১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী ও বিস্তার পর্যালোচনা করতে পারবেন;*
- *১৯৪৯-১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের বিস্তার বর্ণনা করতে পারবেন।*

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। ভাষা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কেবল ধর্মের ভিত্তিতে এক হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করে এই অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। এই রাষ্ট্রের কর্ণধাররা প্রথমই শোষণ ও বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয় বাঙালির প্রাণের ভাষা বাংলাকে। অথচ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় পাকিস্তানের ভাষাগত জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬০% বাংলা, ২৮.০৪% পাঞ্জাবি, ৫.৮% সিন্ধি, ৭.১% পশতু, ৭.২% উর্দু এবং বাকি অন্যান্য ভাষাভাষী নাগরিক। এর থেকে দেখা যায় উর্দু ছিল পাকিস্তানি ভাষাভাষির দিক থেকে ৩য় স্থানে। অন্যদিকে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যার ৪.৪০ কোটির মধ্যে ৪.১৩ কোটি ছিল বাংলা ভাষাভাষী। এখানে ৯৮% বাংলা এবং মাত্র ১.১% ছিল উর্দু ভাষী। অথচ বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বেশ কিছু পরিকল্পনা নেয়। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর এ আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পাকিস্তান সৃষ্টির ছ'মাস পেরুতে না

পেরুতে তারা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রাজপথে নামে যা ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় পর্বের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে।

ক. উর্দু বনাম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে উদ্দেশ্য ও যুক্তি

পাকিস্তানের মতো বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে ঐক্য বন্ধন সৃষ্টির জন্য একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়োজনীয়তা প্রথম থেকেই শাসকগোষ্ঠী অনুভব করেন। পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা থেকে শুরু করে প্রভাবশালীদের বড় অংশ ছিলেন উত্তর ভারত থেকে আগত উর্দুভাষী। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান থেকে শুরু করে পাকিস্তানের উচ্চ পদবীধারীরা ছিলেন উর্দুভাষী মোহাজের। জিন্নাহ ও তাঁর উত্তরসূরি লিয়াকত আলীর মন্ত্রিসভাকে তাই 'মোহাজের মন্ত্রিসভা' বলা হতো। এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৪৭-৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট ২৭ জন গভর্নর জেনারেল/প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রাদেশিক গভর্নর ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ১৮ জন ছিলেন মোহাজের। এদের আবার অধিকাংশের ভাষা ছিল উর্দু। যে কারণে প্রথমে থেকেই শ্রেণী স্বার্থে তাঁরা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিলেন। এমন কি নাজিমুদ্দিন যিনি পূর্ববাংলার উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। স্বভাবতই তারা ও পশ্চিম পাকিস্তানি জনগোষ্ঠী রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সর্বত্র নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এ ভাষাকে বেছে নেয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বহুদিন থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে চর্চা করায় তারা উর্দুর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নের্তৃবৃন্দ ও প্রভাবশালী অংশ পশ্চিম পাকিস্তানি হওয়ায় তারা সকলে এ ভাষার পক্ষে ছিলেন।

তবে পূর্ববাংলায় এর প্রতিবাদ ওঠে। কারণ পূর্ববাংলায় কখনোই উর্দু চর্চা হয়নি। বাঙালিরা গণতন্ত্র, জনসংখ্যাধিক্য ইত্যাদি কারণে ৫৬% বাংলাভাষীদের ভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবি করেছে। এর সাথে জড়িত ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। সব যুক্তি উপেক্ষা করে প্রশাসন, অর্থনীতির কেন্দ্রসহ পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রের রাজধানী স্থাপিত হয় করাচিতে। মুসলিম লীগের প্রভাবশালী অংশের সেখানে অবস্থানের ফলে স্বাভাবিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধ এলাকা এবং পূর্ববঙ্গ অবহেলিত এলাকায় পরিণত হয়। বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগের ব্যবহার, উন্নয়ন কর্মকান্ডের বড় অংশ পশ্চিমে সম্পাদনের ফলে বঞ্চিত পূর্ববঙ্গবাসীদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে শুধু শাসকের বদল হয়েছে। ব্রিটিশ শোষণের বদলে পাকিস্তানি শোষকের আবির্ভাব হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতি, প্রশাসনসহ চাকরি ও পদের ক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চিত করার নীতি। উর্দুকে সরকারি ভাষা ঘোষণা, গণমাধ্যমে ব্যাপক উর্দুর ব্যবহার, সরকারি কর্মকান্ডে যেমন মানি অর্ডার ফর্ম, টেলিগ্রাম ফর্ম, ডাকটিকেট, মুদ্রায় উর্দু ব্যবহার শুরু এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উর্দু ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হলে শিক্ষিত বাঙালিরা এর প্রতিবাদ জানায়। প্রথম থেকেই তাই বাঙালি ছাত্র ও নেতৃবৃন্দের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, দাবি-দাওয়াতে বাংলা ভাষাকেও সরকারি মর্যাদা দানের দাবি তোলা হয়। এভাবে বাংলা ভাষার দাবি পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

খ. ভাষা বিতর্কের উৎপত্তি ও বিকাশ

পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই উর্দু বনাম বাংলা নিয়ে ভাষা বিতর্ক দেখা দেয়। ১৯০৬ সালে যখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের এ অধিবেশনেও এ প্রশ্ন ওঠে। তবে তখন পর্যন্ত এ সমস্যাটি তত প্রকট হয়নি। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের একটি উদ্যোগ নিলে ফজলুল হকের বিরোধিতায় তা সফল হয়নি। তৎকালীন বাংলা সরকারের সময়ও ভাষা নিয়ে তেমন সমস্যা হয়নি। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের প্রাক্কালে এই বিতর্ক মৃদুভাবে দেখা দেয়। কংগ্রেস নেতারা হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে পাল্টা ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ উর্দু ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে খুব ক্ষুদ্র হলেও বাংলার পক্ষে দাবি ওঠে। তবে ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় তখন ভাষা বিতর্ক নতুন রূপ নেয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য দেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়াও বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখক, বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলার পক্ষে বক্তব্য দেন। পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পত্র-পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন। এসময় পূর্ববঙ্গে গঠিত বিভিন্ন সংগঠনও এ বিষয়ে ভূমিকা রাখে।

জুলাই মাসেই কামরুদ্দীন আহমদকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় 'গণআজাদী লীগ' নামে একটি আদর্শভিত্তিক সংগঠন। এই সংগঠন স্পষ্টভাবে বাংলাকে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে। পরের মাসে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভাষা বিতর্ক আরো প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত 'তমদ্দুন মজলিস' সভাসমিতি ও লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। এই সংগঠনের উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' যার আহ্বায়ক মনোনীত হন নূরুল হক ভূঁইয়া। পরবর্তীকালে এ উদ্দেশে কয়েকটি কমিটি গঠিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজ, সাংবাদিক সংঘ বিভিন্ন সভা ও স্মারকলিপির মাধ্যমে বাংলাকে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

তবে পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি ও আশা-আকাঙ্খাকে উপেক্ষা করে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারি কোন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। ঢাকার বাইরেও এ আন্দোলন প্রসার ঘটে। ঢাকায় ৬ ডিসেম্বর প্রতিবাদ মিছিল শেষে বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করেন। যদিও এ পর্যায়ে সরকার ষড়যন্ত্রের পাশাপশি উর্দুভাষী মোহাজেরদের বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ১২ ডিসেম্বর এমনি একটি বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষে বেশ কযেকজন বাঙালি ছাত্র আহত হন। ভাষা সৈনিক নূরুল হক ভূঁইয়া এ ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, "বাঙালিদের উপর অবাঙালিদের এটা যে অন্যায় হামলা ছিল তা সবার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়। বাঙালির মাঝে নিজেদের অস্তিত্ব, জাতীয় সত্তা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ভাষা আন্দোলন দ্রুত জনসমর্থন লাভ করে।" এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর সচিবালয়ের কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করে। সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং ১৫ দিনের জন্যে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

গ. ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের বিস্তার

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের প্রথম থেকেই ভাষা প্রশ্নে বাঙালি জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত অংশ বাংলা ভাষার পক্ষে সোচ্চার হয়। ১৯৪৮ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সকল সদস্যের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এর প্রতিবাদ করে প্রথমে ছাত্র সমাজ। ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। নব গঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। ঐদিন হরতালকালে পুলিশের লাঠি চার্জে অনেকে আহত হন। শেখ মুজিব, শামসুল আলম সহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। শুধু ঢাকা নয় ঢাকার বাইরে সর্বত্র ১১ মার্চ হরতাল ও অন্যান্য দিনের কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনের তীব্রতার প্রেক্ষিতে ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনে রাজি হন।

তড়িঘড়ি করে তাঁর চুক্তি সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফর যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। ১৯ মার্চ জিন্নাহও ঢাকা সফরে এসে ২১ মার্চ রেসকোর্সে নাগরিক সংবর্ধনা, ২৪ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বৈঠক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে মতামত দেন। জিন্নাহর ২৪ মার্চ বক্তৃতার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত ছাত্ররা 'না' 'না' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সাথে ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পূর্ববঙ্গের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। পরিষদে বিরোধী দল এর প্রতিবাদ করলেও নাজিমুদ্দিন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন নি। যদিও শেষপর্যন্ত পরিষদে উত্থাপিত এই প্রস্তাবটিও বাস্তবায়ন হয়নি।

১৯৪৮ সাল জিন্নাহর মৃত্যুর পর বিশেষত মার্চ মাসের পর হতে ভাষা আন্দোলন কিছু দিনের জন্য স্তিমিত থাকলেও বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয়। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষে ৮ এপ্রিল থেকে ১৮ দিন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘট, মেডিকেল ছাত্রদের ধর্মঘট, জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চলে। ১৪ জুলাই পুলিশ ধর্মঘট হয়। সেনাবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে গুলি চলাকালে ২ জন পুলিশ নিহত হয়। এই অবস্থায় ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত খান আলী ঢাকা এলে ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানায়। লিয়াকত আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্য হতে আবারও 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে।

ঘ. ১৯৪৯-১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের বিস্তার

১৯৪৮ সালের পর প্রতি বছর ১১ মার্চ প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করা হতো। ১৯৪৯ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখার সরকারি ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এ উদ্দেশে ১৯৪৯ সালের মার্চে আকরাম খাঁকে সভাপতি করে 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিবাদ জানায়। যদিও শেষপর্যন্ত এর বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৫২ সালে নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে ২৭ জানুয়ারি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ ৩০ জানুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় সভায়ও সরকারি নীতির সমালোচনা করা হয়। এ সময় আব্দুল মতিনকে আহবায়ক করে নতুন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ গঠনের পর আন্দোলনের গতি সঞ্চার করে। নাজিমুদ্দিনের এই উক্তির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ পরিষদই ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গে হরতাল আহ্বান করে। কিন্তু সরকার বিক্ষোভ দমনে ১৪৪ ধারা জারি করলে শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্ব।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তা ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সকল বাঙালির আন্দোলনে পরিণত হয়। একদিকে সরকারের দমননীতি, অন্যদিকে বাঙালি জাতির বাংলা ভাষার পক্ষে দুর্বার আন্দোলন সমানতালে চলতে থাকে। ঢাকায় সূচিত আন্দোলনের বিস্তার মফস্বল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। সে কারণে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন অল্প সময়ে সাফল্য লাভ করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। রতনলাল চক্রবর্তী, *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০।
২। বদরুদ্দীন উমর, 'ভাষা আন্দোলন', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।
৩। *Census of Pakistan 1951, vol. 1 Pakistan,* Karachi,Government of Pakistan, N.d. .

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উর্দু ভাষা ছিল জনসংখ্যার দিক থেকে পাকিস্তানের-
(ক) প্রথম ভাষা (খ) দ্বিতীয় ভাষা
(গ) তৃতীয় ভাষা (ঘ) পঞ্চম ভাষা।

২। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী ছিল-
(ক) ৪.১৩ কোটি (খ) ৪.২৩ কোটি
(গ) ৪.৪০ কোটি (ঘ) ৪.১৫ কোটি

৩। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন-
(ক) নাজিমুদ্দিন (খ) লিয়াকত আলী খান

(গ) সোহরাওয়ার্দী (ঘ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

৪। ভাষার দাবিতে গঠিত প্রথম ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নাম-
(ক) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ
(গ) রাষ্ট্রভাষা পরিষদ (ঘ) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ।

৫। তমদ্দুন মজলিসের আহ্বায়ক ছিলেন-
(ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) কামরুদ্দিন
(গ) আবুল কাশেম (ঘ) নূরুল হক ভূঁইয়া।

৬। বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন-
(ক) কংগ্রেসের সদস্য (খ) মহাসভার সদস্য
(গ) কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য (ঘ) আওয়ামী লীগের সদস্য।

৭। ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট ৮ দফা চুক্তি সম্পাদিত হয় সংগ্রাম পরিষদের সাথে-
(ক) লিয়াকত আলীর (খ) নুরুল আমিনের
(গ) জিন্নাহর (ঘ) নাজিমুদ্দিনের।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ভাষা আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের বিস্তার সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ-৭

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *ভাষা আন্দোলনের কারণ জানবেন;*
- *ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট (১৯৪৮-১৯৫২) আলোচনা করতে পারবেন;*
- *১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জি পর্যালোচনা করতে পারবেন;*
- *২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনা ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *ভাষা আন্দোলনে শহীদদের পরিচয় দিতে পারবেন।*

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন একটি বিশেষ ঘটনা। বলা যায়, পাকিস্তানের পরবর্তী ঘটনা-প্রবাহের ক্ষেত্রে এই ঘটনা বিশেষ প্রভাব ফেলে। '৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হবার সময় থেকেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র সমাজ বাংলা ভাষার বিষয় নিয়ে তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এ বিষয়ে মোটেও আন্তরিক ছিলেন না। তারা উল্টো উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছিলেন। সুতরাং অনিবার্য ভাবেই সংকট সৃষ্টি হয়। এরই চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত ঘটনা প্রবাহ।

ক. ভাষা আন্দোলনের কারণ

আপাতদৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের যে কারণ জানা যায় তা হচ্ছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। এটি এর প্রধান কারণ হলেও বিষয়টি আরো গভীর এবং বিশ্লেষণের দাবিদার। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল বাঙালির সংস্কৃতির প্রশ্ন, ছিল তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নও।

১. সাংস্কৃতিক কারণ: জনগণের বৈষয়িক ও আত্মিক কৃতি বা কাজই হচ্ছে সেই জাতির সংস্কৃতি। সংস্কৃতিই একটি জাতির প্রাণ। সেই সংস্কৃতিকে ধারণ করে, বাঁচিয়ে রাখে ভাষা। ভাষাও ঐ জাতির দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। সুতরাং ভাষার ওপর আঘাত পুরো জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতেরই শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেবার জন্যই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত করা হয়েছিল। অতএব বাংলাদেশের মানুষের প্রতিক্রিয়াও ছিল বেশ জোরালো। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা গোড়াতেই তমদ্দুন মজলিশ গঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে '৪৭ সালেই ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এরও আগে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে দেশের প্রধান পন্ডিতজনেরা কেন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা উচিত তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে পত্রপত্রিকাসমূহেও এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ফোরামেও

বিষয়টি আলোচিত হয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে দাবিটি জোরালো ভাষায় উত্থাপিত হয়। পাকিস্ড্রানের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশী ছিল বাঙালি। স্বভাবতই তাদের ভাষা-সাংস্কৃতি ছিল পাকিস্তানের মূল স্রোত। কিন্তু ক্ষমতাসীন এলিটশ্রেণী এ বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীনতা এবং অবজ্ঞা দেখালে বাঙালিদের আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না।

২. অর্থনৈতিক কারণ: ভাষা আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন হলেও এর পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশের কথা অস্বীকার করা যায় না। পুর্ববঙ্গের বেশিরভাগ মানুষই ছিল একভাষী। তাদের একটা অংশ বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত ছিল এবং অনেকে চাকরি প্রত্যাশী ছিল। বিকাশমান এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাষাজনিত জটিলতায় নিজেদের অবস্থান হারানোর আশংকায় ছিল। একই আতঙ্কে ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ব্যক্তিরাও। তারা পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিয়ে এখানে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। এদেরও বিপদগ্রস্থ হবার আশঙ্কা ছিল। সরকারের নিম্নপদস্থ এসব কর্মচারীদের একটা বড় অংশ বাস করত নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী অংশগুলোতে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। এই সরকারি কর্মচারীরা অচিরেই ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে তাদের মধ্যে যে সচেতনতা জাগ্রত হয় তাই পরবর্তীকালে তাদের নিজেদের দাবি আদায়ের আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল ১০ দিন স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট, একই বছর জুলাই মাসে পুলিশ ধর্মঘট, চা বাগান শ্রমিক, রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের ধর্মঘট, ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সমিতি গঠিত হয়। এরা পরবর্তী সময়ে সরকারের নিকট যেসব দাবি তুলে ছিল তাতে অর্থনৈতিক বিভেদের প্রসঙ্গ ছিল। শুধু সরকারি কর্মচারীরা বা চাকুরী প্রত্যাশীরাই নয় নানাভাবে আতঙ্কিত হচ্ছিল ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্তরা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাদের সামনে অর্থনৈতিক বিভেদের কারণে ইতোমধ্যেই সৃষ্ট বঞ্চনার বিষয়টিতো ছিল, একই সঙ্গে ভবিষ্যতে ভাষা হারানোর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সার্বিক প্রভাবে পড়ার আতঙ্কও তৈরি হয়েছিল। উর্দুকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যম ঘোষণা করায় পূর্ববঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করে এর প্রতিবাদ জানায়। মুসলিম লীগ সরকারের অযোগ্যতা ও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ববঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে এবং পরে ১৯৫১ সালে তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে জনগণ ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এসময় সিলেট, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলার বিস্তির্ণ অঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং তা সশস্ত্র আকারও ধারণ করে। ময়মনসিংহে টংক প্রথা, সিলেটে নানকার প্রথা ও রাজশাহীর নাচোল সাঁওতাল কৃষকরা স্থানীয় ভুমি মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এসব সংগ্রামের ফলে নিপীড়িত কৃষকরা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এভাবে কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী ও নিম্মধ্যবিত্ত জনগণের জীবনে যে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে তার কারণ অর্থনৈতিক হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তা জনগণের রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনের নেপথ্যে কাজ করেছিল সেটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

৩. রাজনৈতিক কারণ: ভাষা আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও অচিরেই এটি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পরিণত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা নেপথ্য জড়িত হয়ে পড়েন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে কংগ্রেস

পার্টির সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টেই গোড়া থেকে বাংলা ভাষার বিষয়টি নিয়ে দাবি উত্থাপন শুরু করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালিরা রাজনৈতিকভাবে অবহেলিত হচ্ছিল। যদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা এক ধরনের ঐক্যে আসতে পেরেছিলেন তথাপিও স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া আধিপত্য এবং পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার বাইরে রাখার প্রচেষ্টা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড় শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভাষা আন্দোলনই ছিল প্রধান দাবি আদায়ের আন্দোলন যেখানে সব শ্রেণীর মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও দাবি আদায়ের প্রতীক হিসাবে ভাষা আন্দোলনের ওপর ঝুঁকে পড়ে। এমন একটা অবস্থায় বলাই বাহুল্য, ভাষা আন্দোলন একটি রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে।

খ. ভাষা আন্দোলন প্রেক্ষাপট

ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত পরিণতি পেলেও এটি ধারাবাহিকভাবে গড়ে ওঠা একটি আন্দোলন ছিল। রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান জন্মলাভের আগে থেকেই ভাষা নিয়ে পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী মহল কথা বলতে শুরু করেছিলেন। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে ভাষা আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত সংগ্রামের রূপ লাভ করে। ১৯৪৭ সাল থেকেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্ড়াব এবং তার প্রতিবাদও শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ২সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তমদ্দুন মজলিশ। এই সংগঠন বিভিন্নভাবে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করছিল। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক হলে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হন শামসুল আলম। ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সারাদেশে ধর্মঘট আহ্বান করেন। আন্দোলন-সংগ্রামের কারণে ৪৮ সালের ১৫ মার্চ আলোচনায় বসতে বাধ্য হন এবং সেখানে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে দুবার ২১ মার্চ এবং ২৪ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোঃ আলী জিন্নাহ পূর্ববঙ্গে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দিলে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বাংলা ভাষাকে আরবিকরণের উদ্যোগ নিলে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দেয়। এভাবেই ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আন্দোলন চলছিল।

গ. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জি

১. ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি-২০ ফেব্রুয়ারি: ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে খাজা নাজিমুদ্দিনের একটি উক্তি থেকে নতুন করে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ২৭ জানুয়ারি নাজিমুদ্দিন ঘোষণা দেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। সুতরাং নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করেন। ঐদিনের সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়। ৩১ জানুয়ারি মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরীতে সর্বদলীয় সভার মাধ্যমে ধর্মঘট সমর্থন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল ডাকা হয়। বার লাইব্রেরির কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা

শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ঐদিন বেশ কয়েকটি সভায় নাজিমুদ্দিনের পল্টনের বক্তৃতার সমালোচনা করা হয়। সভায় এক প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এসময় অবজারভার পত্রিকা বাংলা ভাষার পক্ষে ভূমিকা রাখে। এ অভিযোগ ১২ ফেব্রুয়ারি অবজারভার নিষিদ্ধ হয়।

বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ২০ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ববাংলা আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন। দু'পক্ষের প্রস্তুতির ভিতর আকস্মিকভাবে ২০ ফেব্রুয়ারি সরকার স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। এর মাধ্যমে ঢাকায় কোন প্রকার সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিক্ষোপ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারি এ ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে ঢাকা শহরের উত্তেজেনা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত ছাত্ররা সরকারি হীন সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলে সভা করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ৯৪, নবাবপুর রোডে আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠক বসে। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। অলি আহাদ, গোলাম মওলা, আবদুল মতিন প্রমুখ ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে থাকলেও কর্মপরিষদের অধিকাংশ সদস্য নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার বিরোধিতা করেন। ১১-৩ ভোটে (সংগ্রাম পরিষদের ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন) ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মোহাম্মদ তোয়াহা ভোট দানে বিরত ছিলেন।

কর্মপরিষদের সভার পর অলি আহাদ অন্যান্য যুবলীগ নেতা এবং কর্মীদের সুশৃঙ্খলভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হবার নির্দেশ দেন। ৪৩০/১ যোগীনগরেও অনেক কর্মী তাঁর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি এই উপদেশ দেন। অন্যদিকে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল এ বিষয়ে পৃথক পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় সলিমুল্লাহ হলে ফকির সাহাবুদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে এক সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয় আবদুল মোমিনের নেতৃত্বে। সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তটি শাহাবুদ্দিন আহমদের (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) প্রস্তাবে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আবদুল মোমিন ও শামসুল আলমের ওপর (গাজীউল হক, একুশের সংকলন '৮০, পৃ.১৩৮)। ২০ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে শহীদুল্লাহ হল এবং ফজলুল হক হলের মধ্যবর্তী পুকুর পাড়ে আরেকটি ছাত্রসভা হয়। এখানেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গেরক সিদ্ধান্তসহ স্থির হয়, পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন গাজীউল হক। তিনি যদি গ্রেফতার হন তবে এম.আর. আখতার মুকুল এবং তারপর কামরুদ্দীন শাহুদ সভাপতি করবেন।

ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা ও এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

ছাত্রদের তীব্র উত্তেজনা এবং প্রস্তুতির ভিতর দিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি রাত পেরিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ভোর উপস্থিত হয়। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সকালেই সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাকা পুলিশ কর্ডন করে ফেলে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতারা রাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান করছিল। নেতৃবৃন্দের নির্দেশ সংবলিত চিরকুট জাহানারা লাইজু এবং নিজাম (গাজীউল হকের ছোট ভাই) নামের ২জন বালক ও বালিকা ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেন। এবং নেতৃবৃন্দের নির্দেশ অনুসারে দু'জন করে লোক জমায়েত হতে হতে সভাস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এ সময় শামছুল আলম ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে অভিমত দেন।

কিছুক্ষণ পর শহীদুল্লাহ কায়সার (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) এবং তোয়াহা সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে সত্যাগ্রহের আকারে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে অভিমত দেন। বেলা ১১টায় আমতলায় সভা শুরু হয়। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে এম. আর. আখতার মুকুলের প্রস্তাবে এবং কামরুদ্দীন শাহুদের সমর্থনে গাজীউল হক সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশ সামছুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান প্রমুখ বক্তব্য দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু আবদুল মতিনের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে গাজীউল হক, আবদুল মতিন প্রমুখ ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সবায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ১০/১০ জনের একটি করে দল বেরিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে।

সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম দলের নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী (বিচারপতি ও তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা)। ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী দলগুলো মধ্যে একদল ছাত্রী যোগদান করেন। প্রথম দিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী কিছু ছাত্র গ্রেফতার হন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা আত্মরক্ষার্থে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করেন। পুলিশের পাল্টা হামলায় ছাত্রদের একটি বড় অংশ মেডিকেল কলেজের কাছে সমবেত হন। মেডিক্যাল সমবেত ছাতদের ওপর পুলিশ আকস্মিকভাবে গুলিবর্ষণ করে। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী গুলির নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রট। পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে নিহত হন। আবদুস সালাম গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ এপ্রিল মেডিকেল কলেজে মারা যান। এদিকে ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোজাফফর চৌধুরী, মুনীর চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক পুলিশী কর্মকান্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করেন। উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন তিনদিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ববাংলা আইন পরিষদের অধিবেশন। ছাত্ররা পরিষদের সদস্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। ছাত্র নিহত হবার পর তাঁরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। এ সময় আইন পরিষদে সত্যিকার অর্থে বিরোধী দল ছিল কংগ্রেস। ঐদিন তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিধান সভায় অচলবস্থা সৃষ্টি করেন। মওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ আইন পরিষদে মেডিকেলের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন। পরে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আনোয়ারা খাতুন সহ বিধান পরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য অধিবেশন বর্জন করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

সরকার প্রেসনোটের মাধ্যমে বিষয়টির বিকৃত প্রচারের প্রয়াস গ্রহণ করে। ছাত্র হত্যার খবর শহরে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পরার সাথে সাথে চারদিক থেকে স্রোত এসে মিলিত হয় ঢাকা মেডিক্যাল প্রাঙ্গনে। রেডিও শিল্পীরা এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রথম ধর্মঘট পালন করেন। অবশ্য গুলিবর্ষণের পর আন্দোলনে নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়। পুলিশি হুলিয়ার কারণে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করেন। এ পরিস্থিতিতে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত নয়টায় একটি সভায় গোলাম মাওলার নেতৃত্বে যুবলীগ আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেদিন সন্ধ্যায় আরেকটি পৃথক সভায় ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদদের উদ্দেশে গায়েবী জানাজা, লাশ দাফন এবং মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির ঘোষণায় আন্দোলিত জনতার স্বতঃস্ফূর্ততার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা পরিণত হয় মিছিল, বিক্ষোভ আর শোকের সমন্বয়ে এক উত্তাল নগরীতে। মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদদের জানাজায় লক্ষ মানুষের ঢল নামে। এরপর ছাত্র-জনতার একটি বিশাল মিছিল হাইকোর্টের সামনে পৌঁছুলে সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠি চার্জের শিকার হয়। এক পর্যায়ে পুলিশের

গুলিতে ছত্রভঙ্গ মিছিলকারীরা নাজিমুদ্দিন রোডে একত্র হয়। এরপর মিছিলটি চকবাজার, ইসলামপুর, জগন্নাথ কলেজ, লালবাগ এবং মানসী সিনেমা হল ইত্যাদি এলাকা প্রদক্ষিণকালে পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলিবর্ষণ করেন। পরে মিছিলটি ঢাকা মেডিকেলে এসে সমাপ্ত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত ঘটনা ঢাকার জনজীবনের ব্যাপক প্রভাব ফেলে। রাজপথ ছিল উত্তাল জনতা দীপ্ত পদচারণায় মুখরিত। দোকানপাট ছিল বন্ধ এবং অফিস আদালতে উপস্থিতি ছিল সামান্য। জঙ্গী জনতার ওপর পুলিশ নির্মম গুলিবর্ষণে ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে শহীদ হন ঢাকা হইকোর্টের কর্মচারী রঘুনাথ দাস লেন নিবাসী শফিউর রহমান (২০), লুৎফুর রহমান লেন নিবাসী ওয়াহিদুল্লাহ (৪০) এবং মৌলভীবাজার নিবাসী রিকসা চালক আবদুল আউয়াল (২৬)। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত জনতা মর্নিং নিউজ পত্রিকার প্রেস আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগ করে। জনতার রুদ্র রোষে ভীত নুরুল আমিন সরকার প্রেসনোটের মাধ্যমে ১৪৪ ধারাসহ ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারি করে।

২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি দমননীতি ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন এ.কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে এক জরুরী প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও জনতার ওপর পুলিশের গুলি ও হত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে কতিপয় দাবি সংবলিত প্রস্তাব পাস করা হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে গুলিবর্ষণের নির্দেশদানকারী জেলা প্রশাসক ও অভিযুক্ত পুলিশদের কঠোর শাস্তির দাবি করা হয়। এই সাথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট এলাকা হতে অবিলম্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়ার দাবি করা হয়।সভায় শহীদদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শহীদ পরিবারসমূহের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

অন্যদিকে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের অধিবেশনে ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় ভাষা প্রশ্নে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই অধিবেশনের সরকারি কর্মকান্ডের কঠোর সমালোচনা করা হয়। পরিস্থিতির লক্ষ করে সরকারি দল রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু এই বিলের ওপর এক সংশোধনী প্রস্তাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রের নিকট সুপারিশ করা হয়। এরপর বিধান সভা ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতবী করা হয়। কিন্তু গভর্নর ফিরোজ খান নুনের এক ঘোষণায় ২৪ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের অবসান ঘটে। দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এসব ঘটনার প্রতিবাদে আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন। অনুরূপভাবে 'নওবেলাল' সম্পাদক মাহমুদ আলী মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ঢাকার ছাত্র-জনতা এসব ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকান্ড ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ঐদিনও সক্রিয় থাকে একদিকে জনতার প্রতিবাদী বিক্ষোভ, অন্যদিকে দুর্বিনীত পুলিশের নির্মম অত্যাচার। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফুলার রোডে একজন কিশোর নিহত হয়। অবশ্য তৎক্ষণাৎ তাঁর লাশ অপসারিত হয় লোকচক্ষুর আড়ালে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল পালন করা হয়।সেদিন দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের ভবনে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সকল অনুষদের ডীন, হলসমূহের প্রাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, পূর্ববাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি, ইডেন গার্লস কলেজ, রংপুর কলেজ ও বরিশাল বি.এম. কলেজের অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিজনদের প্রতি সান্তনা ও সমবেদনা প্রকাশ করে। এই সভায় ২৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করে পাকিস্তান বিধান পরিষদের নিকট অবিলম্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত সমূহের অনুলিপি বিধান পরিষদের সকল সদস্যকে প্রেরণ করা হয়। অনুরূপভাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল প্রাঙ্গণে অন্যায়ভাবে ছাত্রদের হত্যা ও গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে শহীদদের আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারকে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানানো হয়।একই সাথে সরকারি নিপীড়ন বন্ধ করে অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের বিনা শর্তে মুক্তিদানের দাবি উত্থাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের ওপর অত্যাচার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা নষ্ট করার প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মচারী কর্মবিরতি পালন করেন।এদিকে দেশের পত্র-পত্রিকাসমূহে আন্দোলনের পক্ষে তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা ও নিবন্ধ প্রকাশ অব্যাহত থাকে।

ডা. সাঈদ হায়দারের নকশা অনুসারে রাতে মেডিকেল কলেজের গেইটের সামনে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ তারিখে তা উদ্বোধন করা হয়। ২৬ তারিখে পুলিশ শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে। ২৫ মার্চ বরকতের ভাই আবুল হাসনাত ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট, এমপি ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে মামলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ২৬ তারিখে পরবর্তী সময়ের আল্টিমেটাম দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

ঢাকার এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। জেলা, মহকুমা শহর অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে তা ছড়িয়ে পড়ে। নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, সিলেট ও সুনামগঞ্জে ২২ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়। এসব জেলায় ২৩ অথবা ২৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালিত হয়।

ঙ. ভাষা আন্দোলনের শহীদ

২১ ফেব্রুয়ারি গুলিতে ঠিক কতজন মারা গিয়েছে তা নিয়ে পরবর্তীকালে নানা কারণে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি লেগে কেউ আবার পরে মৃত্যুবরণ করেছেন। শেষপর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া গেছে ভাষার কারণে ৬ জন শহীদ হয়েছিলেন। শহীদ রফিকউদ্দীন আই.কম. পড়তেন। তাঁর বয়স উনিশ/বিশ ছিল। তাঁর বাড়ি মানিকগঞ্জ। আবুল বরকত ১৯২৭ সালের ১৬ জুন জন্মগ্রহণ এবং ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পাকিস্তানে আসেন। তাঁর পিতার নাম শামসুজ্জোহা। শহীদ শফিউর রহমান ছিলেন হাইকোর্টের কর্মচারী। ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি তার জন্ম। এঁদের তিনজনকেই আজিমপুর দাফন করা হয়। শহীদ আব্দুল জব্বার ছিলেন পেশায় দর্জি। গফরগাঁওয়ের পাচাইয়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। শহীদ অলিউল্লাহর বয়স ৮/৯ বছর। তিনি রাজমিস্ত্রি হাবিবুর রহমানের ছেলে। আবদুস সালাম ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ এপ্রিল মারা যান। তিনি পেশায় পিয়ন ছিলেন।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের জন্য এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘটনার নেপথ্যে অনেক কারণ যেমন বিদ্যমান ছিল তেমনি পরবর্তী ইতিহাসের ওপর এর ছিল অসীম প্রভাব। এই আন্দোলনের সফল

পরিণতিতে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়। এছাড়া পরবর্তীকালে সব আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল ভাষা প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। বদরুদ্দীন উমর, "ভাষা আন্দোলন", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।
২। রতনলাল চক্রবর্ত্তী, *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০।
৩। এম.এম. আকাশ, *ভাষা আন্দোলন : শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯০।
৪। শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ভাষা-আন্দোলনের শহীদেরা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খাজা নাজিমুদ্দিনের যে বক্তৃতার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ও সাফল্য লাভ করে তিনি সে বক্তৃতা দেন-
(ক) বায়তুল মোকাররমে (খ) রেসকোর্স ময়দানে
(গ) পল্টন ময়দানে (ঘ) পলাশীতে।

২। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন-
(ক) মওলানা ভাসানী (খ) কাজী গোলাম মাহবুব
(গ) গাজীউল হক (ঘ) আবদুর রহমান চৌধুরী।

৩। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন-
(ক) ৩ জন (খ) ৪ জন
(গ) ৫ জন (ঘ) ৬ জন।

৪। প্রথম যে শহীদ মিনার নির্মিত হয় তার পরিকল্পনা করেন-
(ক) হামিদুর রহমান (খ) ড. সাঈদ হায়দার
(গ) মোর্তজা বশির (ঘ) কামরুল হাসান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরঃ

১। ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণ লিখুন।
২। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সংক্ষেপে লিখুন।
৩। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ভাষা আন্দোলনের কারণ সংক্ষেপে লিখুন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা বর্ণনাসহ এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

পাঠ-৭

ভাষা আন্দোলনের গুরু ত্ব ও তাৎপর্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাবেন;*
- *এই আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সংকট ঘণীভূত হতে শুরু করে।পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একপেশে ও নেতিবাচক মনোভাবের ফলে বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়। ১৯৪৮ সালে সূচিত প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলন দ্বিতীয় পর্বে ১৯৫২ সালে আরো প্রসার ঘটে। দ্বিতীয় পর্বে ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত শ্রেণী নয়, বরং সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে প্রভাব ফেলে। শুধু ভাষা বৈষম্য নয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালির প্রতি শোষণ ও বৈষম্য এ পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বাঙালির সকল আন্দোলন বিশেষ করে ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন। বায়ান্ন পরবর্তীকালে যাঁরা জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের বড় অংশই ভাষা সৈনিক ছিলেন। এ কারণে ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম সুসংহত স্ফূরণ বলা হয়।

ক. ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই বাঙালিদের কাছে যে প্রশ্নটি সর্বাগ্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয় তা হলো রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে মর্যাদা দেবার পক্ষে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অতিমাত্রায় আগ্রহ। রাষ্ট্র ক্ষমতায় সত্যিকার অর্থে বাঙালির প্রাধান্য না থাকলেও পূর্ববাংলার জনমত ছিল বাংলার পক্ষে। অথচ ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার উর্দুর পক্ষে অভিমত দেয়। ইতোমধ্যে ভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে ১৯৪৬-১৯৪৭ সালেই বিতর্ক উত্থাপিত হলে '৪৭ সালেই ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ভাষার পক্ষে ছোট ছোট কয়েকটি সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। সেপ্টেম্বরে গঠিত 'তমদ্দুন মজলিশ' বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালের শুরু থেকে এ দাবিতে আরো জনসমর্থন মেলে। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাবে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করেন কিন্তু ২৫ তারিখে তা নাকচ হলে পূর্ববাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার

প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে শুরু হয় আন্দোলন যা ১১ মার্চ পূর্ববাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালনের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে। অথচ সরকার এসব বিষয়ে গুরুত্বারোপন করেনি। বরং ১৯ মার্চ জিন্নাহ পূর্ববাংলা সফর করে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় উর্দুর পক্ষে বক্তব্য দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করেন। যদিও একই বছর তাঁর মৃত্যুর পর ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গটি স্থবির হয়ে পড়ে।তবে ১৯৪৯ সালে নতুনভাবে চক্রান্ত শুরু হয়। এবার বাংলা বর্ণমালাকে আরবিকরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। যদিও ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি এই উদ্ভট পরিকল্পনাটি নাকচ করে দেয়। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানেক মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ববাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে তা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৫১ সাল থেকে আবারো ভাষা আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তবে ১৯৫২ সালের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের উর্দুর পক্ষে ঘোষণা সকল মহলে প্রতিবাদের ঝড় তোলে।শুরু হয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব।সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে স্বত:স্ফূর্ত আন্দোলনের সূচনা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলায় হরতাল, বিক্ষোভ ও সভার কর্মসূচি পালিত হয়। ঐদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভকারীরা মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত, আহত হন আরো অনেকে। পুলিশের এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে স্বত:স্ফূর্তভাবে মিছিল, বিক্ষোভ হয়। তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা ছাড়িয়ে জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন এমন কি গ্রামে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে আন্দোলন শুধু ভাষার দাবিতে সীমাবদ্ধ না থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে পরিণত হয়। পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রতি প্রবল ঘৃণার সঞ্চার হয়।

খ. আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

১. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ:** ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তানের মাত্র ৭.২% জনগণ ছিল উর্দু ভাষাভাষী। পক্ষান্তরে ৫৪.৬% জনগণের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা বাঙালি স্বভাবতই মেনে নিতে চায় নি।এর সাথে তাদের জীবিকার্জনের প্রশ্নও জড়িত ছিল। এমনিতে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্য বিষয়টি অমান্য করে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী, প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু স্থাপিত হয়। শাসকদের ভাষা উর্দুকেই তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বেছে নেয়ায় বাঙালিদের চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনীতিসহ সর্বত্র বাঙালিকে বঞ্চিত করার পশ্চিমা মানসিকতা। তাই ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে তারা বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

২. **অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ:** ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে সংশয় দেখা দেয়। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে

বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গণপরিষদে হিন্দু সদস্যদের ভাষার পক্ষে যে কোন প্রস্তাব-বক্তব্যের বিরোধিতা করেন মুসলিম সদস্যরা। মুসলিম লীগ ও শাসকচক্র চিরাচরিত ঐতিহ্যানুযায়ী ধর্মকে ব্যবহার করে ভাষা আন্দোলনকারী ও সমর্থকদের 'ভারতের দালাল', 'অমুসলিম', 'কাফের' বলে চিহ্নিত করেও আন্দোলন থামাতে পারেনি। ফলে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘদিন পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক বৃহৎ রাজনৈতিক দল তাদের দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক সংকট আগের তুলনায় কম ছিল। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে ভাষা সৈনিকরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেন। এতে দেখা যায় যেসব জেলা, মহকুমা ও থানায় ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সেখানে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে।

৩. **রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণঃ** ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ৪টি পৃথক ভাবাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক ধারা লক্ষণীয় ছিল- ১. মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ আবার চারটি উপদলে বিভক্ত ছিল ক. নাজিমুদ্দিন-আকরাম খাঁ গ্রুপ; খ. সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ; গ. এ.কে. ফজলুল হক গ্রুপ; ঘ. মাওলানা ভাসানী গ্রুপ। প্রথম উপদলটি ছিল কট্টর ও উর্দুর পক্ষে। বাকি উপদলগুলো ছিল বাংলার পক্ষে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই বাকি তিনটি উপদলই মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে। ২. আংশিক ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ধারার প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় কংগ্রেস, এদের তেমন প্রভাব না থাকলেও এরা ছিল বাংলার পক্ষে। ৩. বিপ্লবী সাম্যবাদী ভাবধারার প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি। ৪. মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা প্রগতিশীল গণআজাদী লীগ। এরূপ রাজনৈতিক বিভাজন রাজনীতিতে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক মেরুকরণ ঘটায়। রক্ষণশীল মুসলিম ভূস্বামী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী এবং পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ অনুগত নাজিমুদ্দিনের উপদলটি ছিল উর্দু প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। এর কারণ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ভিতর সর্বাধিক প্রভাবশালী সকলের মাতৃভাষা উর্দু। তাদের পেছনে শক্তি যুগিয়েছে এদেশে আগত উর্দুভাষী ভারতীয়রা (মোহাজের)। এদেশে উর্দুভাষী মোহাজেরদের মাধ্যমে উর্দু ভাষা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়। বাংলা ভাষাভাষী মাত্রেই বিদেশী ভাষা উর্দুকে মেনে নেয় নি। জনগণের এই মানসিকতা উপলব্ধি করেই কংগ্রেস, আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণআজাদী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নির্বাচনী কর্মসূচি ও দলীয় কর্মসূচিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ জনগণের এই মানসিকতা উপেক্ষা করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের জোয়ারে অনেক উদারপন্থী মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীরা ভাষা আন্দোলন ও আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতারা আত্মগোপনে থাকায় দ্বিতীয় সারির নেতারা আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে বা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। এ পর্যায়ে অনেক শিক্ষার্থী আওয়ামী মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্ড়ান মুসলিম ছাত্রলীগে সংশ্লিষ্ট থেকে আন্দোলনে অংশ নেন।

৪. **রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের চির বিদায়ঃ** ভাষা আন্দোলনে বিরোধিতা, স্বৈরশাসন, বাঙালির অধিকারের প্রতি উপেক্ষা সর্বোপরি দলের নেতাদের শ্রেণী চরিত্রের কারণে এ দলটি জনবিচ্ছিন্ন হতে সময় লাগে নি। ভাষা আন্দোলনে দলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতাদের ভূমিকা তাদের চরিত্র আরো

উন্মোচিত করে। ১৯৫২ সালেই আওয়ামী লীগ, গণতান্ত্রিক দল, ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের সূচনা করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী মুসলিম গীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামী ইসলামী মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রন্টে যোগ না দিলেও কেউ কেউ আওয়ামী মুসলিম লীগের টিকেটে প্রার্থী হন। সমাজবিজ্ঞানী রঙ্গলাল সেন লিখেছেন যে, ১০ জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগের পরিচয়ে সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের সমর্থক যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন আইন পরিষদ নির্বাচনে তাঁর এলাকার সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন। তাঁর মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের পরিণতি তাঁর মতই হয়। কারো কারো জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর আর কোন নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হতে পারেনি। বরং এ দল পাকিস্তান আমলেই বহুধাবিভক্ত হয়ে একটি দুর্বল সংগঠনে পরিণত হয়। মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক আজাদ ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির জন্য যে ১০টি কারণ চিহ্নিত করে তার প্রথমটি ছিল "বাংলা ভাষার দাবির প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নুরুল আমীন সরকারের দমননীতি।"

৫. **জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা:** ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৫২ সালের আন্দোলন ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিস্থিতি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনায় তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে পরের দিনের গায়েবানা জানাজার পর ঢাকা শহরের পরিস্থিতির ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারো নির্দেশ ছাড়াই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মহল্লা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল রাজপথে নেমে পড়ে। পুলিশের সাথে জনতার বহু স্থানে সংঘর্ষ হয়। সারা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহর ছিল প্রতিবাদ, মিছিল আর হরতালের শহর। ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর মফস্বলে ছড়িয়ে পড়লে সেখানেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, সমাবেশ হয়। প্রতিটি সভায় গণপরিষদ সদস্যদের পদত্যাগ, হতাহত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, বিচার দাবি করা হয়। যেসব এলাকায় আন্দোলন তীব্র ছিল সেগুলো হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনিসংহ, সিলেট, কুমিল্লা, রাজশাহী, পাবনা, যশোর প্রভৃতি শহরে। আন্দোলন শুধু শহরে নয় গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি। এই আন্দোলনে ঢাকার মতোই এই প্রথম কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষ যুক্ত হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গবেষক বদরুদ্দীন উমর জোর দিয়ে বলেছেন, "পূর্ববাংলা কৃষক, শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মেহনতি জনগণের সকল অংশ এ আন্দোলনে যতখানি ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, ততখানি অন্য কোথাও নয়।" বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের "ভাষা আন্দোলন ঃ অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান" গবেষণা গ্রন্থেও একই মত পোষণ করা হয়েছে।

৬. **কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে আঘাত:** তখন সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও মায়ের ভাষর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়েরা রক্ষণশীলতার প্রাচীর পেরিয়ে রাস্তায় নামে। ভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অনেক ছাত্রীই প্রথমে গোপনে পোস্টার লিখে, চাঁদা দিয়ে সহযোগিতা করতো। অবশ্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অনেক মেয়ে সরাসরি মিছিল, মিটিং-এ ছেলেদের সঙ্গে অংশ নেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রথম শোভাযাত্রায় মেয়েরাই প্রথম ছিলেন। ১৯৪৮

সালে যশোর ভাষা সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন হামিদা রহমান। নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের অগ্নিকন্যা ছিলেন মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম। মিছিলে, সমাবেশে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। এছাড়া চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, দিনাজপুর, সৈয়দপুরে নারী সমাজের ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ভাষা আন্দোলনের ফলে এমনিভাবে প্রকাশ্যে মহিলাদের সভা-সমিতিতে, মিছিলে যোগদান সমাজে নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে। ভাষা আন্দোলনের পর পর রাজনীতি, শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

৭. **বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধিঃ** ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব স্বয়ং মুসলিম লীগ পাস করে। যদিও গণপরিষদে তা বাধার সম্মুখীন হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের আগে এ বিষয় কোন অগ্রগতি হয়নি। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে। এছাড়া একই বছর গণপরিষদ পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলা এবং পার্লামেন্টে ইংরেজী ছাড়াও উর্দু ও বাংলায় বক্তব্য রাখার বিধান করা হয়। গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এইভাবে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃত পায়। ১৯৬২ সালের সংবিধানেও একইভাবে বাংলাকে বহাল রাখা হয় যা পাকিস্তান আমলে আর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। এতে বাঙালির আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়। অন্যদিকে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৮. **বাংলা ভাষা চর্চা ও বিকাশঃ** রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়। এই পথ ধরেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। সম্ভব হয় সাংস্কৃতিক খন্ডিত ও বিকৃত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করে তোলার শক্তি ও সাহস।এতোদিন বাংলা সাহিত্যিকে সংস্কৃত ও হিন্দু প্রভাবিত বলার প্রয়াসের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল জোরালো প্রতিবাদ। কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মীরা নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হন। হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শাসসুল হক ও আলো অনেকে কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। আসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৫৩) এই পালাবদলের স্বাক্ষরবাহী। আবদুল দাফফার চৌধুরীর কথায় ও আলতাফ মাহমুদের সুরে রচিত হলো বাঙালির প্রাণের গান 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। প্রত্যেক বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে রচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বাঙালি জাতিকে আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেয়। উর্দু ও পাকিস্তানি সাহিত্য ক্রমে ক্রমে পূর্ববাংলা থেকে বিদায় নেয়। ফলে পাকিস্তান আমলে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তানি পূর্ববাংলাং ছিল প্রায় নির্বাসিত।এভাবে ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৯. **শহীদ স্মৃতির প্রতীক ও আন্দোলনের উৎস শহীদ মিনার তৈরিঃ** ১৯৫২ সালেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় শহীদ মিনার। শুধু ঢাকায় নয় ঢাকার বাইরে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, পাবনার শহীদ মিনার গড়ে ওঠে। এই শহীদ মিনার শুধু শহীদদের স্মৃতিকেই অমরত্ব দেয়নি, প্রতিষ্ঠিত করেছে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এক উদ্দীপনা।শহীদ মিনারই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদ, বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা ও আন্দোলনের

কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরেই পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সহ দেশের প্রায় সকল শহীদ মিনার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১০. **স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা:** ভাষা আন্দোলন ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ক্রমে এর সাথে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকালে ও পরে বিভিন্ন লেখনি ও দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বাংলাভাষা নয় বরং বাঙালিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হয়। গণপরিষদে পূর্ববাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি নিয়োগ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। যুক্তফ্রন্ট এসব দাবিকে প্রথম জনসমক্ষে নিয়ে আসে। যা ষাটের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবিতে পরিস্ফুটিত হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে যা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। তাই বলা যায় যে, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে বাঙালি জাতি প্রথম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেয়। এ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। এ আন্দোলনের শিক্ষাই তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। পরবর্তী দশকে এই চেতনার ক্রমবিকাশ ঘটে যার ফলে একটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের সম্ভব হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। রতনলাল চক্রবর্ত্তী, *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০।
২। আবু মো: দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০।
৩। আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তানের গণপরিষদে প্রথম বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে-
(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৪ সালে
(গ) ১৯৫৬ সালে (ঘ) ১৯৬২ সালে।

২। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়-
(ক) ১৯৫৪ সালে (খ) ১৯৫৬ সালে
(গ) ১৯৬২ সালে (ঘ) ১৯৭২ সালে।

৩। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনের সম্পাদক ছিলেন-
(ক) শামসুর রহমান (খ) আবদুল গাফফার চৌধুরী

(গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান।

৪। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের রচয়িতা-

(ক) হাসান হাফিজুর রহমান (খ) আলতাফ মাহমুদ

(গ) আবদুল গাফফার চৌধুরী (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা লিখুন।

২। ভাষা আন্দোলন কিভাবে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটায় লিখুন।

৩। ভাষা আন্দোলনে জনগণ কিভাবে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশ নেয় তা লিখুন।

৪। বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি ও বাংলা ভাষার বিকাশে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা কি ছিল লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরমালা:

পাঠ-১: ১। (গ); ২। (ক); ৩। (ঘ); ৪। (ক); ৫। (গ); ৬। (ক); ৭। (ঘ)।

পাঠ-২: ১। (গ); ২। (খ); ৩। (ক); ৪। (খ)।

পাঠ-৩: ১। (খ); ২। (খ); ৩। (ঘ); ৪। (গ)।